ভ্রমণ বিভ্রম

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

পাওয়া কাকে বলে যে মানুষ জানে না, ছোঁওয়াকেই সে পাওয়া মনে করে ---রবীন্দ্রনাথ

।। প্রাক কথন ।।

পর্যটন এক প্রাচীন প্রবণতা। এক বিচিত্র বিলাসিতাও বটে। যেখানে যেমন ভাবেই শু হয়ে থাকুক, চাহিদা হিসাবে এর উত্থান অপ্রতিহত। সেকালের ট্রাভেলার এ কালে হয়ে উঠেছে টুরিস্ট। যা ছিল ব্যক্তির আপন খেয়াল তার ক্রমিক ব্যাপ্তি সামা জিক চাহিদায়, আমোদিত অবকাশ যাপনের প্রকরণ হিসাবে। এই ব্যাপ্তির মূলে ক্রমবর্ধমানজনপ্রিয়তা। ভ্রমণ হয়ে উঠল অ াধুনিকতার অপরিহার্য সহচর। আধুনিক ভ্রমণকারী হয়ে উঠল টুরিস্ট। জনপ্রিয়তার অমোঘ অভিমুখ বাণিজ্যায়ন। আবার সফল বাণিজ্যায়নের প্রভাবেই জনপ্রিয়তার জোয়ার। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এ এক নির্বিকল্প জোড়। এই পারস্পরিক পরিপূরণ প্রক্রিয়ার অত্যুজ্জল নিদর্শন পর্যটন। কাজের ব্যস্ততা থেকে ক্ষণিক অবসরের আবডাল খোঁজে মানুষ। শুধু টিন জীবন নয়, চিরচেনা পরিবেশ থেকেও। স্থানান্তরে তার অবকাশযাপনকে উপভোগ্য করে তুলতে তৎপর পেশাদার উদ্যে াগীরা। অবসরবিলাসী মানুষের নিজস্ব মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে আবির্ভূত এই নয়া বৃত্তিজীবী শ্রেণী। তাদের নিবেদিত পশর ার চিত্রার্পিত বিজ্ঞাপন নজরে এলে ঘরে থাকাই দায়। তাদেরই পেশাদারিত্বে উচাটন পর্যটকের অগোছালো ভ্রমণে ক্রমশ পরিকল্পিত রূপারোপ। তার যাত্রা আর সুচিপত্রবিহীন, অবিন্যস্ত হয়ে রইল না।

আজকের বিশ্বের এক অতি বৃহৎ শিল্প টুরিজম। জ্বালানি, মোটরগাড়ি এবং পর্যটন - এই তিনটি শিল্পের স্থান আজকের অ ান্তর্জাতিক বাজারে সবার ওপরে। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের কর্মনিযুক্তির সাড়ে ছয় শতাংশ পর্যটন শিল্পে। টুরিস্ট বা পর্যটক শব্দটির আধুনিক অর্থে কোনও সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নেই। মানুষকে নানা কারণে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে হয়। স্বাস্থ্যের কারণে, পুণ্যার্জনের অভিলাষে, আত্মীয় - পরিজনের সঙ্গে মিলন - বিচ্ছেদ উপলক্ষে, ব্যবসা কিংবা চ াকুরিসূত্রে। এ ছাড়া সাগর - পাহাড়ের টান, নির্জন নিসর্গের হাতছানি, নিছক আয়েসি ছুটি কাটানোর বিলাসিতা - সবরকম উপলক্ষ্যের ভ্রমণের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বে এদের পরস্পরকে আলাদা করা যায় না। পর্যটনের সংজ্ঞা সন্ধান হয়েছে বিস্তর, কিন্তু তার এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। সরকারি পরিসংখ্যানে সাধারণভাবে স্বল্প সময়ের জন্য স্থানান্তরিত মানুষদেরই গণনা করা হয়ে থাকে। সেই হিসাবে সব ধরনের ভ্রমণকারীই পর্যটক শ্রেণিভুক্ত। তবে পর্যটন বা টুরিজম অবশ্যই কর্মব্যপদেশে ভ্রমণ নয়, আমোদ- অবসরে ঘেরা ভ্রমণ। সংখ্যাতত্ত্বে নিখুঁতভাবে ধরা না দিলেও, পর্যটন বলতে ধরে নিতে হয় প্রাত্যহিকতায় সাময়িক যতি টেনে মুক্তির তাগিদে বেরিয়ে পড়া। আর সেই তাগিদে তা দেবার অভিপ্রায়েই পর্যটন এ সময়ের অন্যতম বর্ধিষ্ণু শিল্প।

প্রাচীনকালের ভ্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে যে কৃচ্ছ্রসাধন প্রবণতা তাতে স্বাভাবিক কারনেই বীতস্পৃত আধুনিক টুরিস্ট যাদের আ বির্ভাব উনিশ শতকের শুর দিকে। তার ভ্রমণ - বিলাস ছকেবাঁধা আয়েসি সফর। এক কালে ধারণাছিল, আটপৌরে চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পড়া মানে চিত্তের মুক্তি, কিংবা বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে অন্তত সাময়িক স্বস্তি। এই বিশ্বাস আগলে য ারা সে যুগে অচেনার পথে পা বাড়াত, তাদের কাছে গন্তব্যস্থলটি ভ্রমণের সর্বৈব আকর্ষণ ছিল না। পথের কষ্ট, যন্ত্রণা, ক্লা

ন্তি ও সুখের অম্লমধুর অভিজ্ঞতাও তার প্রাপ্তিকে সমৃদ্ধি, সম্পূর্ণতা দিত। আজকের পর্যটক সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে নারাজ। ভ্রমণ তার প্রতিদিনের কর্মক্লান্তি অপনোদনের উপায়। নির্ঝঞ্ঝাট, নিপদ্রব, অভাববিহীন, মসৃণ সফরে তার পর্যটন-পরিতৃপ্তি। তার চাহিদার রঙ স্বভাবতই আলাদা। পথের প্রাপ্তিতে তার স্পৃহা নেই। তার দৃষ্টি গন্তব্যে। ভ্রমণের আ দিকালে ছিল তীর্থযাত্রা। যাত্রীদের সমাবেশে উঁচুনিচু সবাই সামিল।কালের প্রভাবে ভ্রমণের নেশা ধর্মের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে বিত্তবান সমাজের বিলাসিতার উপকরণ। ক্রমে মধ্যবিত্তের জগতে তার বিস্তার সমাজ - সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে। জেফ্রি চসার যদি এ যুগের লেখক হতেন, তা হবে অবশ্যই তাঁর কেন্টারবেরিগামী তীর্থযাত্রীদের কাহিনিটি সমস্ত উপাদান অটুট রেখে হয়ে উঠতে পারত অত্যাধুনিক প্যাকেজ টুরের একটি অনবদ্য উপাখ্যান। বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তকলকাতা শহরের অবস্থাপন্ন বাঙালি সমাজে দস্তুর ছিল পশ্চিমে হাওয়া বদল করতে যাওয়া। সৈয়দ মুজতবা আলির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মর্তব্য--- আড্ডা আর ভ্রমণ ছাড়া বাঙালিকে ভাবাই যায় না। অনেকেরই নিজস্ব আবাস ছিল ঝাড়গ্রাম, গিরিডি, শিমুলতলা, দেওঘর, মধুপুর ঘাটশিলা ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর জায়গায়। সেখানকার জল - হাওয়ার টানে, শরীর মনের উন্নতির অভিলাষে নিয়মিত যাতায়াত চলত। আজকের ভ্রমণার্থী আর শুধুই পশ্চিমমুখো হয়ে বসে নেই। পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ সবদিকেই উজাড় তার পর্যটন - প্রীতি। এই প্রীতিভোজে সামিল মানুষের ভিড়ে মধ্যবিত্তই, বলাবাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ। যাবতীয় আয়োজন তাদেরই সেবায় উৎসগীকৃত।

ভ্রমণের আধুনিকতায় তীর্থস্থানের গুত্ব লাঘব হয়নি মোটেই। বরং হয়ে উঠেছে আরও জনপ্রিয়। পুণ্যের আধার হিসাবে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে। তুষারতীর্থ অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী কিংবা আরও দুর্গম তীর্থপথের জনসমাবেশে ভ্রমণবিলাসীদের সংখ্যা পুণ্যার্থীদের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। যা ছিল দ্রষ্টব্য হিসাবে চিরপুরনো কিংবা আদৌ কোনওদিন ধর্তব্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়নি, সে রকম অনেক জায়গা নতুন সাজে, অভিনব চেহারায় হয়ে উঠেছে টুরিস্ট স্পট। পর্যটন - পিপাসু জনতার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে নিত্যনতুন স্থান। বদলেছে ভ্রমণ, বদলেছে ভ্রমণকারীর মানসিকতা। ছোট বড় যে কোনও আকারের ছুটিতে এখন মানুষ বহির্মুখী। পুজোর ছুটি এগিয়ে এলে পরস্পরের কাছে একটিই প্রশ্ন,.... এবার কোথায় যাচ্ছেন? সুদুরপিয়াসী জনতাকে ঘিরে পর্যটন - বাণিজ্যের পসার। পর্যটকের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা প্রতিদিনের জীবন - সংঘাতে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষকে নির্ঝঞ্ঝ াট সফরসুখ উপহার দেবার জন্য সদাপ্রস্তুত। আয়োজনের যাবতীয় দায় তাদের। সম্ভাব্য ক্রেতার পছন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে উপহার দিয়ে চলেছে নতুন নতুন প্যাকেজ। তাদের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে অচেনায় পথের পাড়ি দিচ্ছে লাখো মানুষ পাহাড় - সাগর, শহর - বন্দরের পথ - পরিক্রমায়।শুধু অর্থমূল্য ধরে দিলেই ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ। নিশ্চিন্ত সফল ও নিশ্চিন্ত বাণিজ্যের সহাবস্থান। একঘেয়ে ক্লান্তিকর কর্মস্থল, টিভির পর্দা, ছুটির সন্ধ্যায় ক্লাব, হোটেল, দাবা, রোস্তোরাঁ যতটা অপরিহার্য, ততটাই জরি প্যাকেজ মোড়া পরিপাটি ভ্রমণ। যে ক্রেতার পছন্দের প্যাকেজ যত ব্যয়বহুল, ততই মহিমময় তার সামাজিক অবস্থান। পরজীবী পর্যটকের দুনিয়ায় দূরের নেশায় মাতাল, প্রকৃতিপ্রেমী, খেয়ালি ভ্রমণার্থীরা লুপ্তপ্রায় প্রজাতি। ধর্মভী মানুষের পুণ্যসন্ধানী পথের যার শু, সেই তীর্থভ্রমণের সঙ্গে কর্মব্যস্ত মানুষের ক্লান্তি আপনোদনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না ছিল যাবতীয় মানসিক দীনতা, বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে চিত্তের মুক্তির সন্ধান। আজকের পর্যটন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সত্যিই মাল থেকে বেড়াল হয়ে ওঠার বিচিত্র কাহিনি।। একদিকে যেমন দায় প্রতিদিনের ক্লান্তি আর একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণের অপরদিকে তেমনই পর্যটনকে উপলক্ষ করে আধুনিক সমাজে বিশিষ্টতা অর্জনের সুযোগ। অ াধুনিকতার প্রতিযোগিতায় বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্রও অন্যান্য গৃহসামগ্রীর যে ভূমিকা, পর্যটনপ্রীতিও তার অংশীদার। ক াছে - দূরে পা বাড়ানো এ যুগের মানুষ তাই আর খেয়ালি ভবঘুরে নয়। আবার ভ্রমণ তার ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির বশবর্তীও নয়। একটি পূর্ণমাত্রার বিবিস্তারী শিল্প। পর্যটকতাই আর নিছক বিষয় - উদাসী ভ্রমণকারী নয় - উৎপাদিত পণ্যের নিয়মিত ক্রেতা ও ভোক্তা। এই পণ্য তার বিষমমুখী অস্তিত্বের শেকড়টিকে আরও গভীরে ছড়িয়ে দেয়। ভ্রমণ - সংস্কৃতির এই বিবর্তনের পথে আধুনিক ভোক্তা-ভ্রমণকারীর অবস্থান এক আশর্চ্য বৈপরীত্যের দিকনির্দেশ।

।। কবে আমি বাহির হলেন ।।

ব্রিটিশ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এ দেশের বিত্তশালী সমাজ ভ্রমণ সংস্কৃতির ইজারা নেয়। উচচবিত্ত ভারতীয়দের কাছে সাহেবি

সৌখিনতাকে আত্মস্থ করার বিভিন্ন পন্থার সঙ্গে দূর - ভ্রমণও যুক্ত হয়। ভ্রমণ - বিলাসিতা সে সময়ে তাদের দৃষ্টিতে সাহেব হয়ে ওঠার একটি দুর্লভ সুযোগ। উচচবিত্তের বিলাসিতার সামগ্রীটি যখন কালক্রমে মধ্যবিত্তের আওতায় এসে পড়ল, সেই সুবাদেই ঘটল এ দেশের ব্যাপক এবং সুদুরপ্রসারী পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের ভ্রমণের অতীত - বর্তমান জুড়ে হিমালয়। সময়ের প্রভাবে তা হয়েছে আরও জমকালো। পর্যটকদের চি পছন্দের অজস্রতা কখনও নিরাশ হয়নি তার কাছে এসে। সেই তীর্থযাত্রার যুগ থেকেই হিমালয়কে ঘিরে আপামর মানুষের আকর্ষণ অমোঘ ঈশ্বর ও নিসর্গ প্রেমের মিলনক্ষেত্র হিসাবে। হিমালয়ের কোলে কোলে ছড়িয়েতীর্থস্থান। যত দুর্গম তত বেশি তার মাহাত্ম্য। ভারতীয় হিমালয়ের পশ্চিম - মধ্য অংশে গাড়োয়াল অঞ্চল গোটা পর্বতশ্রেণির পবিত্রতম এলাকা। গঙ্গোত্রী, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ---তীর্থযাত্রীদের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। পাহাড়শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা হিমবাহ দেবাদিদেব মহাদেবের কেশদাম, এ রকমটাই লোকায়ত বিশ্বাস। তীর্থযাত্রীদের কাছে কেশদাম, এ রকমটাই লোকায়ত বিশ্বাস। তীর্থযাত্রীদের কাছে গঙ্গার উৎসমুখে মৃত্যু পরম পুণ্যদায়ী। আবার বৌদ্ধ ধারণায়, কৈলাশ পর্বতের পথে প্রাণ হার ানোর চেয়ে সৌভাগ্যজনক আর কিছু নেই। একদিকে শতাব্দী - প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ, অপরদিকে উজাড় করা নিসর্গ সৌন্দর্যে আসক্ত মানুষের কাছে এর ভুমিকা অপার শান্তির পীঠস্থান হিসাবে সেই উদার প্রকৃতির সমারোহের মধ্যে ভ্রমণকারীরা আবিষ্কারকরেছে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সুবাদে 'দেবতাত্মা হিমালয়'

দূরের আহ্বানে প্রায় বিষয়-বিমুখ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, সে যুগে এমন পর্যটকের সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না। এদের অন্যতম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ভ্রমণের নেশায় তিনি জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতেই বলতে গেলে ক্ষণিকের অতিথি। 'হিম ালয় ভ্রমণ' রচনাটি ভ্রমণ - পাগল মহর্ষির একান্ত অনুভব। হিমালয়ের পথে আগুয়ান মহর্ষি লিখছেন, 'আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনও দেখি ন াই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোটছোটব্রতপুষ্পগুলির উপর অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।' ১হিমালয়ের বিশালতা ও সৌন্দর্যের সামনে ভারতীয়দের মতো বিদেশি পর্যটকেরাও সমান আপ্লুত। ১৮২৪ সালে কুমায়ুন অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষ করে ব্রিটিশ পর্যটক বিশপ হেবার লিখছেন ঃ 'Everything around was so wild and magnificent that man appeared as nothing and I felt myself as if climbing the steps of the alter of god's great temple.'২

সেই যুগের ভ্রমণ অনেক ক্ষেত্রে সংসারবৈরাগ্যের সূচনা করেছে। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে আবিষ্ট ব্যক্তির উত্তরণ ঘটেছে এক প্রসারিত চৈতন্যে। পরবর্তী সময়ে হিমালয় - ভ্রমণে বৈচিত্র এনেছে তার অফুরাণ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য। সব ধরণের ম ানসিকতা ও চির ভ্রমণকারীদের সন্তোষবিধান মতো সম্পদ তার অঢেল। আদিকালের তীর্থযাত্রী থেকে আধুনিক পর্যটক সবার কাছে সমান জনপ্রিয় হিমালয়। ক্রমশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের শৈলশ্রেণি। তার মূলে নিশ্চিত ভাবেই ব্রিটিশ প্রভাব। ব্রিটিশ জমানা শু হবার পর থেকে এ দেশের ভ্রমণ-সংস্কৃতিতে জোয়ার আসতে শু করে। এ দেশে আসার পর ব্রিটিশেরা গোড়ার দিকে আস্তানা গেড়েছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে। অসহনীয় তাপ ও রোগব্যাধির প্রকোপ থেকে রেহাই পেতে সামুদ্রিক আবহাওয়ায় তারা স্বস্তি খুঁজত। সাগরতীরে ভ্রমণকেন্দ্রের উদ্ভব তাদেরই সৌজন্যে।

উনিশ শতকের গোড়ার থেকে ব্রিটিশ বাসিন্দারা দেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে শু করে। তা শুধু প্রশাসনিক সুবিধার জন্য নয়। তাদের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াটাও একটা বড় কারণ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত মজবুত করার পর এ দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শীতলতায় তারা আবিষ্কার করে অভ্যস্ত স্বদেশি জলবায়ু। সমতলের গরমে রোগ - ব্যাধি থেকে দূরে থাকার জন্য শৈলপ্রদেশই প্রকৃষ্ট বিকল্প। উত্তরে হিমালয়ের গায়ে নৈনিতাল, দেরাদুন, সিমলা, দার্জিলিং ইত্যাদি। দক্ষিণে নীলগিরির কোলে মহাবাল্বের, উটকামন্ড, মাথেরান, কুনুর ইত্যাদি স্থানগুলি রাতারাতি শৈলশহর হয়ে উঠল। এই জায়গাগুলিকে ত ারা বলত Edenic sanctuaries বা স্বর্গোদ্যান-সদৃশ স্বাস্থ্যনিবাস। দেখতে দেখতে প্রায় ৬৫টি হিল স্টেশন গড়ে ওঠে উত্তর - দক্ষিণে। ইওরোপীয়দের প্রিয় জায়গা হবার সুবাদে এ দেশের উচচবিত্ত সমাজের নজর পড়ল এ দিকে। সাহেবিয় ানা রপ্ত করার নানা প্রচলিত পন্থার সঙ্গে এটিও যুক্ত হল তাদের জীবনে। রাজা - মহারাজা, বণিক, বিত্তশালী আইনজীবী ও অন্যান্য ভারি পেশার ভারতীয়রা হিল স্টেশনের ইওরোপীয় আভিজাত্যে মজতে শু করে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে। অর্থ ও সংস্কৃতির অহঙ্কার বলে তারা ব্রিটিশ সমাজের সান্নিধ্যের দাবিদার। ফলত, শৈলশহরগুলিতে ইওরোপীয়

সমাজের আঙিনায় তাদের আনাগোনা শু। এই ভ্রমণপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কিছুটা ধর্মীয় বিশ্বাসও। পাহাড়ের পথে ভ্রমণে যে শারীরিক ধকল তা তাদের যুগিয়ে দিত হরিদ্বার কিংবা হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থপথে যাত্রার কৃচ্ছ্রসাধন এবং পুণ্য অর্জনের আবেগ। সুদীর্ঘ পথ ঘোড়ার পিঠে, টাঙায়, নৌকোয়, ঝাঁপান অথবা পালকিতে দুর্গম পথে যাত্রা অশেষ কষ্টকর। 'হিমালয় যাত্রা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতে ছিলাম তখন পর্বতের উপত্যকা অধিত্যকা দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে, পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।'

উনিশ শতকের মাঝামাঝি শৈলশহর গড়ে ওঠার সেই কালে বেনারস থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে একমাসেরও বেশি সময় লেগে যেত। অনেক সময় কুলি - বেহারারা প্রাণান্তকর পরিশ্রম থেকে রেহাই পাবার জন্য মাঝপথ থেকে পালিয়ে বাঁচত। ১৮৪০ সাল নাগাদ কলকাতা থেকে দার্জিলিং ছিল পাঁচদিনের পথ। মাদ্রাজ থেকে নীলগিরিও সেই সময়ে দিনপাঁচেকের দুরত্বে। ১৮৩৪ সালে টমাস মেকলে এই পথ পেরন এক সপ্তাহে। বম্বে থেকে যাত্রীরা সমুদ্রপথে ৭০ মাইল, নদীর উজানে তিরিশ মাইল, তারপর হাঁটাপথে আর ৩৫ মাইল পেরিয়ে তাদের গন্তব্যস্থল মহাবাল্লেশ্বরে পৌঁছত। সেই সময়ে কলকাতা থেকে সিমলায় গ্রীষ্মাবাসে যাবার জন্য গভর্নর জেনারেল মহোদয় সদলবলে রাজভবন থেকে ১০০০ মাইলেরও বেশি পথ অতিত্রম করতেন মাসাধিক কাল ধরে।

এ দেশে বসবাসরত ইওরোপীয়রা অনেকে এই হিল স্টেশনগুলির মধ্যে খুঁজে পেত আঠেরো শতকে ইংল্যান্ডে সমুদ্রের ধ ারে গজিয়ে ওঠা সৈকতাবাসগুলিকে। ব্রাইটন, ম্যাগেট, স্বারবরো এবং ওয়েমাউথ -এর সিসাইড - রিসর্টগুলো দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও- দেশে। একই ঘটনা বাথ, বাক্সটন, চেলটেনহ্যাম, টানব্রিজওয়েলস -রে স্পা-টাউনগুলোর ক্ষেত্রেও। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল এই সব স্থানগুলির রোগ নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে। তারা ভাবত, সমুদ্রের জল স্নান ও পানে ব্যবহার করলে অসুখ - বিসুখের উপশম হয়। ব্রিটিশদের ধারণা ছিল ভারতের শৈলশহরগুলিও সেই ধরনের নিরাময় কেন্দ্র হয়ে উঠবে। ১৮৩৯ সালে যখন দার্জিলিং-এ একটি স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলা নিয়ে দ্বিধা - দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন কলকাতার একটি সংবাদপত্রে লেখা হয় Darjeeling must and will be our Brighton'৩ একই রকমভাবে মহ াবাল্লেশ্বরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের বিষয়ে দাবি উঠেছিল ঃ We have no Bath or Cheltenham, as at home, where freedom from care and enjoyment of a large and gay society generally performs those cures which are attributed to the virtues of their far – famed springs,৮

জনপ্রিয়তার কারণে মুসৌরি হয়ে ওঠে হিমালয়ের মার্গেট৫। আবার অনেকের ধারণায়, সিমলার সঙ্গে কলকাতার স ম্পর্ক ব্রাইটনের সঙ্গে লন্ডনের সম্পর্কের মতোই। দক্ষিনে উটকামন্ডও একই রকম মর্যাদা পেতে লাগল। নীলগিরি পর্বতের ওপর সমুদ্রপিঠ থেকে ৭৫০০ ফুট ওপরে চিত্রার্পিত এই শৈলশহরটি দ্রুত হয়ে উঠল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এই তিনটি হিলস্টেশনের খ্যাতি উপমহাদেশে ছড়িয়ে যায়। মর্যাদায় প্রায় সমতুল্য স্থানে মহাব াল্লেশ্বর, নৈনিতাল ও দার্জিলিং। জনপ্রিয়তায় এদের পরই মাউন্ট আবু, কুনুর, ডালহৌসি, কোদাইকানাল, মাথেরন, মুড়ি ও শিলং। ভ্রমণার্থীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, ততই এ সব জায়গায় সামাজিক জীবনপ্রাণবন্ত এবং কসমোপলিটান হয়ে উঠতে থাকে। অপেক্ষাকৃত শান্ত, ছোটখাটো হিল স্টেশনগুলির সঙ্গে এদের মর্যাদার তফাত বাড়তে থাকে। ভারতে বসব াসকারি ব্রিটিশদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল তাদের পক্ষে প্রথম শ্রেণির হিলস্টেশনে বেড়াতে যাওয়া সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে।

১৮৭০ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট বলা হয়, কলকাতার স্বল্প ও মাঝারি আয়ের ভ্রমণেচ্ছুদের কাছে দার্জিলিং হল 'সিলড বুক'। এই আয়ের অঙ্ক ধরা হয়েছিল, মাসে পাঁচ - ছশো টাকা পর্যন্ত। উনিশ শতকের শেষদিককার একটি হিসাব অনুযায়ী সিমলার মতো জায়গায় থাকতে হলে মাসিক আয় অন্তত ১৫০০ টাকার কম হলে চলবেনা। দুর্বলতার সামর্থের ভ্রমণার্থীদের তাই ছোটখাটো হিলস্টেশন খুঁজে নিতে হত। এই ধরনের শ্রেণি বিভাজনের নজির হাতের কাছেই। ইংল্যান্ডের সমুদ্র - সৈকতগুলিতে অবাঞ্ছিত ভিড় যাতে উচচবিত্ত পর্যটকদের অবসর বিনোদনেবাধা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য কিছু কিছু জায়গা পরিকল্পনামাফিক ভাবে ব্যয়বহুল করে তোলা হয়। স্বভাবতইসাধারণ মানুষ সে ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদ ায় ভাগ বসাতে পারবে না। দার্জিলিংয়ের ব্যাধি নিরাময় ক্ষমতার সুখ্যাতিতে পশ্চিমীবাবুরা পঞ্চমুখঃ It is incredible

what a few weeks of that mountain air does for the Indian – born children of European parents. They are taken there sickly, pallid or yellow, soft or flabby, to become transformed into models of rude health and activity. ৬সিমলা, উটি, মহাবাল্লের ও অন্যান্য হিলস্টেশনগুলিও স্বাস্থ্যোদ্ধারের আদর্শ জায়গা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। হিলস্টেশনগুলির ভারতীয়করণ দেশের স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করেনি। উনিশ শতকের শেষদিকেই পশ্চিমীকেতাদুস্ত ভারতীয়দের প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনায় ইওরোপীয় সান্নিধ্যসুখের সন্ধানে হিলস্টেশনে যাতায়াত শু। মাথেরান বম্বে থেকে মাত্র ৫৪ মাইল। ১৮৮০ সালের মধ্যেই বহু ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভারি পেশায় নিযুক্ত ভারতীয়রা ছুটিতে নিয়মিত মাথেরান যাতায়াত শু করে। ১৮৮২ সালেই যেখানে ভারতীয়দের জন্য পাঁচটি হোটেল। এছাড়াও ধর্মশালা, স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০২ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব এইচ. এইচ. রিজলি ক্ষুণ্ণমনের যে রিপোর্ট জমা দেন তাতে বলা হয়ঃ 'নিঃসন্দেহে অর্থবান ভারতীয়দের মধ্যে পাহাড়ে গ্রীষ্ম কাটানোর প্রবণতা বাড়ছে'৭ শিল্পপতি জে.এন.টাটা মাথেরান-এ গড়লেন উইকএন্ড রেসর্ট, কুচবিহারের মহারাজ দার্জিলিং-এ স্থাপন করেন কয়েকটি ভিলা, সিমলায় চারটি বাড়ি, উটিতে একটি। আবার শিলং -এ শ্রেষ্ঠ বাড়িটির মালিকঢাকার নবাব। এ দেশের বাণিজ্যিক সুতিকাগার বম্বে। সেখানকার ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, আমলা ও অন্যান্য পশ্চিমীভাবাপন্ন ভারতীয়রা অবসর বিনোদনের জন্য আকর্ষণীয় জায়গার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাহাড়ের টানই তীব্রতম। কলকাতা ছিল পশ্চিমী সংস্কৃতিতে দীক্ষিত ভারতীয়দের সব চেয়ে পুরনো নিবাস। সেখানকার নাগরিকেরা ছুটি কাটানোর জন্য পাহাড়মুখী হয়ে ওঠে। গন্তব্য মূলত দার্জিলিং কিপলিঙ -এর আ টেল অব টু সিটিজ কবিতায় রয়েছে, The babus…stealing to Darjeeling.

১৮৮৭ সালে দার্জিলিং-এ লুইস জুবিলি স্যানিটারিয়াম তৈরি হল। সেখানকার খদ্দেরদের বেশির ভাগ কলকাতাবাসী। রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবের ১৯০৩ সালের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ ইদানীং এদেশের লোকেদের দার্জিলিং ভ্রমণ বড্ড বেড়ে গেছে।৮ তারা থাকত কোনও বোর্ডিংহাউস অথবা এই স্যানিটারিয়ামে। ভ্রমণের জন্য প্রিয় সময় ছিল এখানকার মতোই সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাস, অর্থাৎ পুজোর ছুটিতে। ১৮৪০সাল নাগাদ গড়ে ওঠাসাহেবদের এই সাধের শৈলাবাস ছিল ভ্রমণেচ্ছুদের জন্য কম খরচে বেড়ানোর জায়গা, পরিভাষায় 'লো-কস্ট ডেস্টিনেশান'।

উনিশ শতকের শেষাশেষি সিমলায় পর্যটকদের ভিড়ে পাঞ্জাবিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবস্থাপন্ন পাঞ্জাবিরা সেখানে ছুটি কাটাবার জন্য বাংলো কিনতে থাকে। যেমন কিনেছিল বাঙালিরা, বিহারের নানা জায়গায়। ১৯২০ সাল নাগাদ সেখানে বেশ কিছু হোটেল গড়ে ওঠে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য। দুই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মাঝারি স্তরের আই. সি.এস অফিসারদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তারাও দাবি করল পূর্বসুরি ব্রিটিশ অফিসারদের সমমর্যাদার সুযোগ - সুবিধা। প্রসঙ্গত, এদের মধ্যে ছিলেন যশস্বী লেখক বেদ মেহতারবাবাও। তিনি ছিলেন জনস্বাস্থ্য বিভাগে একটি উঁচুপদে। প্রতিবছর গ্রীষ্মে তিনি সপরিবার সিমলায় যেতেন। নৈনিতালেও ভারতীয়দের যাতায়াত ক্রমাগত বাড়তে থাকে। দক্ষিণে উটিতেও তাই। এই যাত্রায় ইন্ধন যোগাল গাইড বুকগুলি। হিলস্টেশনগুলি সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্যাদি সম্বলিত বই বাজারে বেরতে লাগল। তাতে স্থানমাহাত্ম্য থেকে শু করে যাতায়াত, আহার - অবস্থান, বিনোদন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে বিশদ বিবরণ থাকত। এক কথায় আজকের টুরিস্ট গাইডের প্রাথমিক সংস্করণ। সমতলের রোগ- ব্যাধি ও অন্যান্য ঝুটঝামেলা থেকে রেহাই পেতে হলে পাহাড়েই শ্রেয়, এই কথাটির বিশেষভাবে উল্লেখ থাকত বইগুলিতে। আর থাকত পাহাড়ের রোগ নিরাময়কারী জল - হাওয়ার গুণকীর্তন থাকত যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস ও রক্তাল্পতা জাতীয় অসুখের উপশমে পাহাড় - ভ্রমণ কত জরি তার সাতকাহন। মানসিক কষ্ট - যন্ত্রণা লাঘব করার ক্ষেত্রে পাহাড় কত উপকারি তার উল্লেখও বাদ যেত না। আর সেই সঙ্গে নিসর্গ শোভার মনোহারি। বর্ণনা। দার্জিলিং সম্পর্কে একটি পুস্তিকার বক্তব্যঃ The voice of the silence from afar will whisper into your ears and your fancy will lift you up on its wings and carry you to a region of heavenly ecstasy conjuring up an unspeakable sense of the infinite glory of the great unseen Hand behind. ৯ এই বর্ণনা অবধারিতভাবে মনে করিয়ে দেবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অখিলমাতার হস্ত অনুভব।

সরকারি কাজকর্ম গ্রীষ্মে শৈলশহরে স্থানান্তরিত করার প্রথায় ছেদ পড়ে ১৯৩০ এর শেষদিকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাটতি পড়ায় শহরগুলির পৌরকর্তারা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট হলেন। যুক্তপ্রদেশ সরকার যখন নৈনিতাল থেকে

গ্রীষ্মকালীন প্রধান কার্যালয় তুলে নেয়, তখন সেখানকার পৌরবোর্ড একটি প্রচার ও উন্নয়ন বিভাগ গড়ে তোলে ভ্রমণসহায়িকা ও অন্যান্য প্রচার - পুস্তিকা প্রকাশ করে ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করবার জন্য ১৯৩৯ সালে এই বিভাগের ভারতীয় অধিকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী পর্যটকের সংখ্যা আবার বাড়তে শু করে। ব্রিটিশ জমানা শেষ হয় আপামর ভারতীয়ের মধ্যে পাহাড়ের আকর্ষণ সংক্রামিত করে। স্বাধীনতার পর শৈল শহরগুলির চেহারা বদলাতে লাগল। গ্রীষ্মাবকাশ যাপনকারিদের ভিড়ে ঘিঞ্জি হয়ে উঠতে লাগল। দোকানপাট, হোটেল - রেস্তোরাঁর রমরমা বেড়ে গেল। ছোটখাট ছুটিতেও বেরিয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল। এর আর একটি বড় কারণ মোটরগাড়ির আগমন। ব্রিটিশদের মতোই ভারতীয়রাও গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য দলে দলে পাহাড়ের শরণাপন্ন। অবসরযাপন, বৈচিত্রের সন্ধান, প্রকৃতির সান্নিধ্য, প্রাত্যহিক জীবনের চাপ থেকে সাময়িক মুক্তির দায় তাদের টেনে নিয়ে চলল পাহাড়ে। বাঁধনবিহীন উচ্ছ্বাসে কখনও বা বেপরোয়াও কেউ কেউ। অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার শুও সেই থেকেই। 'সহসা হিমালয়', 'হিমালয় বিচিত্র' ইত্যাদি ভ্রমণকাহিনির লেখক ধ্রুব মজুমদারমশাইয়ের ভাষার শরণ নিলে পরিবর্তনের ধরণটা এরকম পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ...যাত্রীর সাক্ষাৎ মিলত। দেখে চট করে বোঝা যেত না, কিন্তু এরা ছিল আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সৃষ্টিশীল হিমালয় যাত্রার একেবারে শেষদিককার যাত্রী। পেছনদিক থেকে মোটরগাড়ি ধাওয়া করে আসছে, মাঝেমাঝে ডিটোনেটরে বিকট আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকাপথে তখনও যাত্রীদের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত। তারপরই ওলোটপালোট হয়ে গেল। উন্নয়ন এল, পর্যটন এল, আর সবশেষে ভীমগর্জনে এল প্রতিরক্ষা। চতুর্দিকে মোটর রাস্তা ছড়িয়ে পড়ল, পুরনো তীর্থপথ বাতিল হয়ে গেল, চটিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল, আর তার বদলে গজিয়ে উঠল অজস্র ছোট টাউনশিপ। বিবিধ ভারতীয় কোলাহলে পাহাড়ি ঝরনার কলতান চাপা পড়ে গেল। ছড়িদারকে হটিয়ে দিয়ে এল সরকারি টুরিষ্ট অফিসার। চটিওয়ালার বদলে এল ধূর্ত হোটেলওয়ালা।১০

।। রেলপথ ধরে।।

এই ওলটপালটের পেছনে বৃহত্তম ভূমিকা অবশ্যই রেলওয়ের। সারাদেশ জুড়ে তার কর্মকাণ্ড। রেলপথেরদুর্দম বিস্তারে সাগর থেকে পাহাড় সূচনা করল সেই আশ্চর্য মেলবন্ধনের, যার কৃপায় ভ্রমণস্পৃহা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সাধারণ মধ্যবিত্ত জনতার জগতে। পর্যটনের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করে উত্তর - পশ্চিম রেলওয়ের সেলস ম্যানেজার সিমলায় এক কর্তাকে লেখেন নতুন পর্যটককুল আবির্ভূত হয়েছেঃ

Experience with our rail – cum – road schemes from Bengal, Bombay, United provinces, central India and the Punjab to kashmir indicate that there is a new class of visitors increasing in numbers annually who visit hill stations. This class consists almost entirely of respectable Indian gentlemen and their families recruited from the professional classes, I.e., doctors, teachers, students, small landlords and successful businessmen.১১

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে রেলওয়ের আবির্ভাব ভ্রমণ - সংস্কৃতিতে নিয়ে আসে যুগান্তর। শৈলশহর থেকে সাগর সৈকত অবধি সস্তায় ও কম সময়ে স্থানান্তরিত হবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এল সাধারণ্যে। ১৮৫৫ সালে কলকাতা থেকে রানিগঞ্জ রেলপথ চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে গর গাড়িতে কষ্টকর দার্জিলিং যাত্রার পথ এক ঝটকায় ১২০ মাইল কমে গেল। ওদেকে দেশের উত্তরে চলেছেই ইস্টবেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের ব্যাপক বিস্তার। তবুও শোনা যায়, ১৮৭৩ সালে এডওয়ার্ড লিয়ারকে আটদিনের যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল দার্জিলিং - এর পথে। মাঝরাস্তায় তাঁর গর গাড়িটি ভেঙে পড়ে। কুলিরাও পালিয়ে যায়। ১৮৮১ সালে ন্যারোগেজ রেলপথ পৌঁছোয় দার্জিলিং - এ। এর ফলে সমতলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় কলকাতাবাসী মাত্র একুশ ঘন্টায় পৌঁছে যেতে লাগল সেখানে। রেলের আশীর্বাদ যথাসময়ে পৌঁছে গেল সিমলা ও পশ্চিম হিমালয়ের অন্যান্য শৈলশহরে। ১৮৯৬ সাল থেকে ভ্রমণকারীদের আম্বালা জংশন অবধি ট্রেনে যাতায়াত শু। সেখানে ঘোড়ার গাড়ি ধরে ৩৮ মাইল পথ পেরিয়ে পাহাড়ের তলায় ছোট্ট গ্রাম কালকায়। সেখান থেকে ঘোড়ায় পিঠে কিংবা ঝাপানে চেপে আঁকাবাঁকা ৫৬ মাইল পথ ধরে গিল স্টেশন। কালকায় রেলপথ আসে ১৮৯১ সালে। তারপর বছর দশেক ধরে পাহাড়ের ভেতর অজস্র সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সিমলায় রেলের আগমনবার্তা ঘোষিত হয় ১৯০৩ সালে। ১৯০০ সালে হরিদ্বার থেকে দেরাদুন রেলপথ চালু হলে মুসৌরি উত্তর ভারতরে সবচেয়ে সুগম শৈলশহর হয়ে ওঠে। দক্ষিণভারতেও একই ভাবে মাদ্রাজ থেকে উটকামন্ড পৌঁছতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত

দুদিনের বেশি সময় লাগত। ন্যারোগেজ চালু হলে ১৮৯৯ নাগাদ তা অনেক কমে যায়। দেশের যে কোনও হিলস্টেশনই রেলজংশন থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। সময়েৰ ব্যবধান কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর জোয়ার। রেলপথ চালু হব ার আগে পর্যন্ত হিলস্টেশনে বহিরাগতরা আসার অনুমতি পেত শুধু কর্মসুত্রে আর চিকিৎসা - সংক্রান্ত কারণে। এবার স্ব ল্পকালের বিশ্রামে উৎসাহী মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল যথারীতি। সেই সুবাদে হোটেল, বোর্ডিং ও। উটিতে ১৮৫৭ সাল অবধি ছিল দু'টি মাত্র হোটেল। ১৮৮৬ সালে সংখ্যাটিবেড়ে গিয়ে দাঁড়াল এগারোতে।

ভারতীয় মনস্তত্ত্বে ভ্রমণ এবং রেলওয়ে কীভাবে একাকার, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর ম াসে প্রচারিত একটি সংবাদে। খবরটি ছিল এরকম ঃ লেফটেনান্ট কর্নেল কুপেজ নামে এক ব্রিটিশ সেনা অভিসার অমরন াথে গুহা সন্দর্শনে যান। পবিত্র শিবলিঙ্গ থেকে তিনি খানিকটা বরফ খাবলে নেন দুপুরের খাবারে যাতে ব্রান্ডিও জল ঠান্ডা থাকে। এই হঠকারিতার ফল ভোগ করতে বিশেষ দেরি হয়নি তাঁর। বছর কয়েক বাদেই সাহেব উন্মাদ হয়ে যান। তারপর সেই অবস্থায় এক দিন রেললাইনে মাথা পেতে আত্মহত্যা করেন তিনি। ক্ষিপ্ত দেবতা এভাবে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেন।১২ রেলওয়ের আগমন ঘিরে গণ - পর্যটনের সুত্রপাত ইংল্যান্ডে যেভাবে হয়েছিল, এ দেশেও প্রায় তেমনটাই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংল্যান্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে রেলভ্রমণের ধূম পড়ে। ভ্রমণ যত জনপ্রিয় হতে থাকে, ততই পর্যটকদের স্টেটাসের তারতম্য প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সমুদ্রতীরে ভ্রমণের খরচ কম বলে সেখানে স্বল্প আয়ের ভ্রমণ ার্থীদের নজর গেল। ফলে বিত্তশালী, মর্যাদা - সচেতন শ্রেণির চোখে সমুদ্রের আকর্ষণ রইল না। বহু পর্যটনকেন্দ্রে প্রমাদ গুনতে লাগল। অর্থবান ত্রেতারা বিমুখ হলে শুধু পর্যটনকেন্দ্রের কৌলিন্য বলেই নয়, মাথায় হাত পড়বে। ব্যাবসায়ীদেরও। ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকপুল এ রকমই একটি জায়গা। শঙ্কিত সম্ভ্রান্ত পর্যটককূলের আর্জি - এক্ষুনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সস্ত ার ট্রেনযাত্রা আর স্রোতের মতো পর্যটক ঢুকতে দেওয়া বন্ধ করা হোক। নইলে ব্ল্যাকপুল অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে, আর ভদ্রলোকেদের কাছে এ জায়গাটির কোনও কদরই থাকবে না। ভাড়া সস্তা হলে মাস টুরিজম-এ যে রমরমা, তারে ব্যঙ্গ করে রাসকিন মন্তব্য করেন, 'এবার আধঘন্টার মধ্যে বাক্সটনের সব মূর্খেরা বেকওয়েলে, বেকওয়েলের মূর্খেরা সব বক্সটনে পৌঁছে যাবে।'১৩ পশ্চিমবঙ্গে যেসব পর্যটনকেন্দ্র মাস টুরিজমের জন্য ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত তাদের অন্যতম দার্জিলিং।

তবে এ কথা ঠিক, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পর্যটকসমাজে শ্রেণিবিভাজন এতটা কদর্য হয়ে ওঠেনি এখনও। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে রেলওয়ের সৌজন্যে পর্যটনের ধারণাটিই আমূল পাল্টে যায়। প্রায় স্থাণু একটা সমাজ চলিষ্ণু হয়ে ওঠে। দৃষ্টিতে জুড়ে যায় নতুন মাত্রা, প্রকৃতির বিশালতাকে অনুভব করার এক আশর্চ্য প্রেক্ষিত। এই অনুভব দৃশ্যপট হয়ে ফুটে ওঠে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে, 'সিংহভূম' রচনায় তিনি লিখছেন ঃ

স্টেশনের পর স্টেশন চলিয়া যাইতেছে। শরতের ঝলমলে রৌদ্র সবুজ নারিকেল বনে, সুপারি গাছের সারিতে, শেওলাভর া পুকুরঘাটে, খড়ের ঘরে, ধানের মরাইয়ে মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ, জলা--হৈমন্তী ধান সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, সামনেদূরে বিচালি ছাওয়া গ্রাম, তাহাদের সকলের উপর মেঘহীন, নির্মল নীল আকাশ। কোলাঘাটের পুলপার হইবার সময় দূরে নদীর বাঁকে একটা অন্তরীপ কী সুন্দর দেখাইতেছে। দু- দশটা নারকেল গাছ, আর একটুখানি সবুজ তৃণাবৃত মাঠ, সেখ ানটাতে যেন নদীর মধ্যে অনেকখানি ঢুকিয়া গিয়াছে--শরতের দুপুরে কী সুন্দর তার দৃশ্য।

চলচ্ছবির এই ক্রমবিস্তারি দৃশ্যপট স্পষ্টতই ধাবমান ট্রেনের জানলা থেকে দেখা। শুধু ভ্রমণের সুযোগ আপামর জনতার ক াছে পৌঁছে দেওয়া নয়, নিজের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে প্রকৃতিকে দেখার এই অভিনব প্রেক্ষিত যুগিয়ে দেবার ক্ষেত্রে রেলওয়ের অবদান ঐতিহাসিক। রেলভ্রমণে সব শ্রেণির মানুষকে প্রবৃত্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ নানারকম পুস্তিকা প্রকাশে উদ্যোগী হল। ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের একটি পুস্তিকায় লেখা হল- 'শিলং ইংল্যাণ্ডেরহ্যাম্পশায়ার ও সারের কে ানও কোনো জায়গার মত সুন্দর।' ঈস্টইন্ডিয়ান রেলওয়ের এ রকম একটি প্রচার - পুস্তিকার নাম ছিল ছুটির দিনে বিপুল আয়োজন। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অনেক বইপত্র বেরতে থাকে মানুষকে ভ্রমণে যথাসম্ভব উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে। ট্রেনের যাত্রাপথ অনুসরণ করে আঞ্চলিক বিবরণ তথা ভ্রমণকাহিনি রচনার একটি ধারাও চালু হয়। ১২৬২ বঙ্গাব্দে 'রেলপথে বঙ্গদর্শন' নামে একটি বেশ স্থূলকায় বই লেখেন কালিদাস মৈত্র। এর পঁচিশ বছর পর দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' নামে একটি বই বাজারে আসে। এটি উত্তভারত থেকে কলকাতায় রেলপথের ভ্রমণের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত। তারপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সঙ্কলিত 'পথপ্রদর্শক অর্থাৎ রেলগাড়িতে পথভ্রমণের

সহায়' নামে বইটি বেরয়। আবার ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে থেকেও এই জাতীয় একটি বই প্রকাশ করা হয় ১৯৪০ সালে। দু'খণ্ডের এই বইটির নাম 'বাংলায় ভ্রমণ'। কিংবদন্তিমূলক কাহিনির ওপর জোর দেওয়া হলেও ভ্রমণ নির্দেশিকা হিসাবে ও সমসাময়িক তথ্যসংকলনের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুত্বপূর্ণ। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখা হয়ঃ 'পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির যে যে অংশে বহু বঙ্গভাষাভাষীর বাস আছে এবং বাংলার সহিত যাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, বাঙ্গালি ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য এইপুস্তকে তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রেলপথের নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত রেলস্টেশন হইতে মোটরযান, স্টিমার বা নৌকাযোগে যেসকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনস্থানে যাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইল।' এর আগে ১৯২৮ সালে পূর্ব রেলওয়ের প্রচারদপ্তর পুজার ভ্রমণ নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল। তাতে কলকাতা থেকে কাশ্মীর--- রেলপথ সন্নিহিত প্রধান ভ্রমণকেন্দ্রগুলির থেকে কাশ্মীর--- রেলপথ সন্নিহিত প্রধান ভ্রমণকেন্দ্রগুলির বিস্তা রিত বিবরণ ছিল।

।। আজকের পর্যটন।।

আজকের পর্টটকও তীর্থযাত্রী। তবে তার তীর্থযাত্রার সংজ্ঞা আলাদা। আধুনিক তীর্থযাত্রীর কাঁধের ঝুলিতেধর্মগ্রন্থ নেই। নেই যাত্রাপথে কৃচ্ছ্রসাধনের দায়ও। তার সুটকেসে টুরিস্ট গাইডবুক আর পকেটে মুশকিল আসান ক্রেডিট কার্ড। ভ্রমণক ারী হিসাবে যতটা, তার চেয়ে ঢের বড় ভূমিকা ক্রেতা এবং উপভোক্তা হিসাবে। তার ভ্রমণ - বিলাস বিষয়বৈরাগ্যের প্রকাশ নয়, বরং উল্টোটাই। নিজের সামাজিক অবস্থানের ভিত আরও উন্নত ও পোক্ত করে তোলাই আধুনিক টুরিস্টের প্রধান লক্ষণ।

আধুনিক পর্যটনের সূচনা, বলতে গেলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। অনেক গবেষকের মতে মধ্যবিত্ত পর্যটকের এই উত্থান বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধের এক বিরাট সামাজিক - সাংস্কৃতিক ঘটনা। কার কার মতে উনিশ ও বিশ শতকের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফসল টুরিজম, যা ছিল উচচবিত্তের সামগ্রিক এক্তিয়ারে। রেলপথের বিস্তার ও মোটরগাড়ির চল বেড়ে যাবার প াশাপাশি অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তন ও অনিবার্য ওঠে। অফিসে, কলকারখানায় সময়কে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, ছুটি সংক্রান্ত আইনকানুন বিধিবদ্ধ করা --- ইত্যাদির সুবাদে সাধারণ মানুষের জগতে অবসরসময়ের ভূমিকা বড় হয়ে উঠতে থাকে। শুধু কাজ দাবি করা নয়, কাজের গুণাগুণ সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে বাধ্য হল। ছুটি কর্মীদের দক্ষতা বাড়ায়। সুতরাং অবসরযাপন উপভোগ্য করে তোলার জন্য চালু হওয়া সবেতন ছুটি ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি উপঢৌকন নিতান্ত ঘরকুনো মানুষকেও নিশির ডাক দিয়ে বাইরে টেনেআনে। ভ্রমণের প্রবণতা থাকুক, চাকরি সুবাদে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো সদ্ব্যবহার না করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় জৌলুস থাকে না। জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য স্থান ভ্রমণ, যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ও আর াম শুধুনিত্যদিনের একঘেয়েমি থেকে নিষ্কৃতি দেয় না, প্রতিবেশীর ঈর্ষার কিছুটা বাড়তি ইন্ধনও যোগায়।

১৯৯৩ সালের লেজার স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন -এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, গড়ে ৬,৪০,০০০ ঘন্টা আয়ুবিশিষ্ট একজন মানুষ ৬০,০০০ ঘন্টা ব্যয় করে কাজে, এবং ২,৮০,০০০ ঘন্টা অবসর সময় পায়, অদুর ভবিষ্যতেতার কাজের সময়ের গড় আরও কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৪০,০০০ঘন্টা। অবসর যাপন এবং ভ্রমণের জন্য তার প্রাপ্তি হবে তিনলক্ষ টাক া।১৪ অবসরের ভাঁড়ারের সমৃদ্ধি তাকে যুগিয়ে দেয় বাড়তি উপার্জনের প্রবৃত্তি। বাড়তি আয় ব্যক্তিকে প্রমোদভ্রমণের ব াড়তি সামর্থ যোগায়। ক্রেতা হিসাবে আরও সমর্থ হয়ে ওঠার প্রেরণাবশত পর্যটন - বিলাসের পরিতৃপ্তি। এই বিলাস দৃষ্টির নয়, আয়েসের। দূরে কোনও পাহাড়ের কোলে, কিংবা হোটেল - সৈকতবাসে যথেষ্ট বিলাসিতায় আহার - অবস্থান ও কেনাকাটার সুখ চরিতার্থ হবার নিশ্চয়তা না থাকলে সফর নিরর্থক। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ সঙ্গত ক ারণেই আধুনিক পর্যটকদের ভ্রমণকারীর মর্যাদা দিতে নারাজ। ভ্রমণকারীরা স্বভাবত সক্রিয় এবং অ্যাডভেঞ্চার - প্রিয়। পক্ষান্তরে, টুরিস্ট নিষ্ক্রিয়, আমোদবিলাসী, পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ড্যানিয়েল বুরস্টিন এর মতে টুরিজম হল বাস্তবতা - বর্জিত, তুচ্ছ ও নিস্তেজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যা পুরোপুরি বানিজ্যিক নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঘেরা। তাঁর বক্তব্য, ভ্রমণের দুঃখজনক পরিণতিই হল গণ - পর্যটন। প্যাকেজ নামে শব্দটির আবেদনের কাছে ব্যক্তির ভ্রমণ সমর্পিত। কারণ, দলবদ্ধ ভ্রমণ শুধুই কম খরচে স্বচ্ছন্দ বিহার নয়, একদম অচেনা পরিবেশেআনন্দ এবং নিরাপত্তা--দুইয়েরই আশ্বাস। সেকালের ভ্রমণার্থীর প্রার্থিত ছিল মিশ্র অভিজ্ঞতা। আজকের পর্যটকের কাঙ্ক্ষিত নির্জঞ্ঝাট, সৌখিন সফর। নিজস্ব উদ্যোগে সে নির াসক্ত। গুপি আর বাঘা প্রথম সুযোগেই ভূতের রাজার কাছে যেখানে খুশি যেতে পারার বর চেয়ে নিয়েছিল। তাতে পথশ্র

মের বালাই নেই। এক লহমায় যে কোনও জায়গায়পৌঁছে যেতে সক্ষম তারা। আজকের পর্যটকের জন্য ভূতের রাজা সশরীরে হাজির ভ্রমণেৰ দায়দায়িত্ব সানন্দে বইবার জন্য। ক্যামেরা প্রস্তুত কারক বহুজাতিক সংস্থা কোডাক-এর এক কালে বহুল প্রচারিতশ্লোগান ছিল 'ইউ প্রেস দ্য বাটন, উই ডু দ্য রেস্ট', যা আজকের ভ্রমণবিলাসের মর্মবাণী। টুর কনডাকটরের অভিভাবকত্বের ওপর পর্যটক শিশুর মতো নির্ভরশীল। তার ভ্রমণসূচি পূর্বনির্ধারিত। অর্থ এবং অভিভাবকত্ব দুই-ই মসৃণ সফরের স্বার্থে নিবেদিত। তার ভ্রমনসুচিতে নিজস্ব সময় বলে যেমন কিছু নেই, নেই নিজস্ব দৃষ্টিও। সরবরাহ ও ভোগের এই প্রক্রিয়াটিতে অপরাপর ক্ষেত্রের মতোই পর্টটকও ক্রেতা হিসাবে অভ্যস্ত ও আস্থাশীল। গন্তব্য নির্বচন ও দ্রষ্টব্য পরিভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অনায়াসলভ্য, তখন ক্রেতার উপভোগে স্বভাবতই প্রাপ্তিসুখ খুব গভীর নয়, আয়োজন অঢেল হলে প্রাণের আনন্দে ঘাটতি পড়ে। 'আমাদের এই ভ্রমণের - কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়,' (যাত্রী) এই আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের, সেই ১৯২৭ সালে।

উনিশ শতকের মানুষের সাধারণ প্রবণতা ছিল সঞ্চয়। বিশ শতকে অর্থনীতির মূলমন্ত্রে ভোক্তাকে যথাসম্ভব ব্যয়ে প্ররোচিত করা। একুশ শতকে সেই মন্ত্র আরও উচ্চকিত। আধুনিক ভোক্তার আনন্দ ক্রয় এবং স্বত্বলাভে সীমাবদ্ধ। উপযোগিতা কেন্দ্রিক উপভোগের প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। টুরিস্ট হয়ে ওঠার ঘটনাটি, বস্তুতপক্ষে, মধ্যবিত্তের আধুনিকতার অঙ্গ। একটি দামি গাড়ি কিংবা সুন্দর বাড়ির মালিকানার মতোই। মূল প্রশ্নটি সোস্যাল স্টেটাস- এর। নিজের প্রকৃত সামাজিক অবস্থানের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণিভুক্ত হিসাবে জাহির করার অন্যতম উপায় হল, সমর্থ ক্রেতার ভূমিকায় উত্তরণ। এই উত্তরণ প্রয়াসের সূত্রে জীবন কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও উত্তেজনা খুঁজে পায়। ব্রিটেনে মধ্যবিত্ত মানুষ অবসর সময়ের চল্লিশ শতাংশ ব্যয় করে পর্যটনে। অন্যথা তার স্টেটাসের লেখচিত্র নিম্নগামী। ভোগ, অবসরযাপন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বাকি বিশ্বের মতোই কসমপলিটান কালচার সন্ধানী। ঝিায়নের প্রভাবে তা আরও দুর্বার। সিনেমা, টিভি, হোটেল - রেস্তোঁরা সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে গেছে পর্যটন। নগর শহর সদর মফস্বলের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তের জগতে আধুনিক প্রচারমাধ্যম অনবরত পৌঁছে দিচ্ছে ভোগসুখের নবতম ষোড়শোপচার। যে কোনও পণ্যের মূলত দু'ধরনের মূল্য থাকে। একটি হল ব্যবহারিক মূল্য যা মানবিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। অপটিরর প্রতীকী ক্ষমতা - বিনিময় মূল্য। সব পণ্যই তো শ্রমের ফসল। শ্রম হল পণ্যমূল্যের প্রাথমিক উৎস। পণ্যটির যত বাণিজ্যীকরণ ঘটে ততই সে নতুন নতুন মূল্য পরিগ্রহ করে। একটি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে পৌঁছে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হওয়া - মাত্র পণ্যে পরিণত হয়। মানবিক পরিষেবাও আধুনিক উৎপাদনের অঙ্গ, যেহেতু তা পণ্যের বিমূর্ত বিনিময়ের পথ সুগম করে। সুতরাংপর্যটন যথার্থই একটি পণ্য। আর পাঁচটির পণ্যের মতোই পর্যটন প্যাকেজও বিজ্ঞাপনী প্রচারের মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য। দ্বিতীয়ত, মানুষকে বোঝানো যে ভোগের মাধ্যমে শুধু তৃপ্তি নয়,মানসিক - শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সুখ, বিশ্রাম ও প্রাণশক্তির পুনর্দ্ধার সম্ভব। বিজ্ঞাপন ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে তার স্বতঃস্ফূর্ততা বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞাপিত পর্যটন পণ্যের ভোক্তা হতে। নিত্যদিনের কায়ক্লেশে বিপর্যস্ত মানুষটির কাছে অবসর বিনোদনের সুখটুকুর ষোলোআনাই কাম্য। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাইতেপ্যাকেজই তার কাছে বেশি লোভনীয়। আয়োজনের ধকল এড়িয়ে, সবরকম দায়ভারমুক্ত পর্যটক প্যাকেজ-এর নিটোল নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত। সংরক্ষিত যাত্রা, একই পথের পথিকদলের সান্নিধ্য, অপেক্ষাকৃত কম খরচে বিলাসবহুল থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা, গাইডের চোখের আলোয় দেশদর্শন, পরিচিত পরিবেশে সুরক্ষিত পথচলার স্বস্তি। হঠাৎ অসুস্থতায় বিপন্ন হয়ে পড়া বা স্থানীয়দের অবাঞ্ছিত সান্নিধ্যের আশঙ্কাও নেই। যে-অনিশ্চয়তা আধুনিক জীবনে দিবারাত্রের সঙ্গী, বিনোদনের স্বার্থে তা থেকে সাময়িক রেহাই পাবার জন্য অর্থমূল্য দিতে কার আপত্তি নেই। পর্যটনশিল্পের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে বাজারসমীক্ষার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত জনতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও পছন্দ সঠিকভাবে যাচাই করার ওপর। ভোগস্পৃহার মধ্যে আধুনিকতার যে বহিঃপ্রকাশ, তা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পন্থায় বৈচিত্র খোঁজে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবার প্রতিক্রিয়ায় বিলাসদ্রব্যের বাজারে তার অহং - অন্বিত উপস্থিতি। নিজের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করার জন্য বিকল্প কিছু তার জানা নেই। বিশ শতকের অর্থনীতি উনিশের সঙ্গে ব্যবধান গড়ে তুলল ঢালাও উৎপাদন আর ভোগের সংস্কৃতির সৌজন্যে। পর্যটনের যত বিস্তার ঘটছে, ততই সংস্কৃতিকে প্যাকেটে মুড়ে, বাজারদরনির্ধারিত করে আর পাঁচটা জিনিসের মতো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সচ্ছল পর্যটককে শিল্পদ্যোগীরা জানিয়ে দিচ্ছে, 'পৃথিবীটা তোমাদের ভোগ্য। প্রাকৃতিক সম্পদ,সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য--- সবকিছুই অর্থমূল্যে বিনিময়যোগ্য। তুমি অর্থবান হলে এ সবকিছুই তোমার জন্য স

াজানো।'১৬

এই আনন্দযাত্রার পথ আরও সুগম করেছে প্রচারমাধ্যম। টিভির অজস্র চ্যানেল, দৈনিক পত্রিকার জমকালো ক্রোড়পত্র, সাময়িকপত্রের ফোটোফিচার প্রতিনিয়ত নতুন - পুরনো পর্যটনকেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত রঙিন ছবি উস্কে দিচ্ছে জনতার ভ্রমণবিলাস। শুধু পর্যটন বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা গত কুড়ি বছরে যত বেড়েছে তার হিসাব থেকেই বাণিজ্য হিসাবে টুরিজম এর হালফিল চেহারা ও চাহিদা অভিব্যক্ত। সেই সঙ্গে ইন্টারনেটে দ্রুত ভেসেউঠছে বহু ওয়েবসাইট অসংখ্য দ্রষ্টব্যস্থানের ইতিবৃত্ত নিয়ে। বাস্তবে যত সুন্দর, পর্দায় তার বিবরণ ও ছবি অন্তত দশগুণ। পর্যটনসংস্থার ঠিকানা, দ্রষ্টব্য সংক্রান্ত তথ্যের আহরণ থেকে শু করে ঘরে বসে পরিকল্পিত ভ্রমণের সবরকম ব্যবস্থা করে ফেলা সম্ভব। প্রচারমাধ্যমের সৌজন্যে লোভনীয় সব ফ্যান্টাসি মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার উপকরণ। ইতিবৃত্ত নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা নেই। জনপ্রিতার মানদণ্ডে স্থান নির্বাচন। পর্যটকদের চাহিদা ঘিরে বাজার ছেয়েরয়েছে অজস্র টুরিস্ট গাইড বই। তাদের বেশির ভাগেরই উপজীব্য বহুল প্রচারিত পর্যটনকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে চর্বিতচর্বণ। তথ্যের নবীকরণের বিশেষ প্রয়াস নেই। শুধু যে নতুন জায়গার খবর দুষ্প্রাপ্য তাই নয়, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের ছড়াছড়ি। আরও বিপজ্জনক, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খুব কম বই - ই লেখা। 'বাংলায়ভ্রমণ' কিংবা স্বামী অপূর্বানন্দের লেখা 'কৈলাস - মানসতীর্থ' জাতীয় ভ্রমণ- সহায়ক বইগুলির সঙ্গে আজকের প্রকাশনাগুলির কোনও তুলনাই চলে না। ভ্রমণবিষয়ক পত্রিকাগুলোতে অখ্যাত স্থানের কিছু কিছু হদিশ থাকে বটে, তবে অধিকাংশ পর্যটকের পছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রকাশিত হয় বলে প্রকৃত ভ্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়ে ওঠে না। ২০০১ সালে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'পর্যটন' সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল, কিন্তু হাস্যকর তথ্যেরও সমাবেশ যথেষ্ট। সেখানে সম্ভব্য পর্যটকদের অবগতির জন্য দার্জিলিং সম্পর্কে লেখা হয়েছেঃ 'শিলিগুড়ি থেকে দুরত্ব ৮০ কি.মি., বাসে ৩৫ ঘন্টা, ট্রেনে ৭৫ ঘন্টা।' আবার কালিমপঙ প্রসঙ্গে, 'দুরত ঃ শিলিগুড়ি ৬৯ কিমি। ২৫ ঘন্টা'১৭ এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিলাসিতার উপকরণের অভাব ও যোগাযোগের অব্যবস্থা সৌন্দর্যে মোড়া টুরিস্ট স্পটের আবেদনও ম্লান করে দেয়। যেখানে বিলাসদ্রব্যের আকাল, সেখানে পৌঁছবার দায় নেই পর্যটকের। মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা, উড়িষ্যার ধবল্গের কিংবা বিহারের ধলভূমগড়ের মতো ইতিহাস - ঘেরা জায়গায় হঠাৎ হাজির কোনও পর্যটকের নিশ্চিতমনে পড়বে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিলাপ ঃ 'ভ্যালি অব দি কিংস আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাকপিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড়বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে---ভ্যালি অব দি কিংস অতীতকালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামি সিগারেট ও চুটের ধোঁয়ায় -- কিন্তু তার চেয়ে কোনও অংশে রহস্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই পালিশ নাই, ঐর্শ্ব নাই, মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত।'১৮

রোমান্টিক পর্যটক এভাবেই আগ্রাসী 'কালেক্টিভ' এর কবলে পড়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, রোমান্টিক টুরিস্ট আজ এক অবাঞ্ছিত প্রজাতি। পর্যটন বিপণনের জগতে এরা ক্রেতা বা ভোক্তা কোনওটিই নয়। পর্যটনশিল্পের সঙ্গে তার সতত বিরোধ। প্রকৃতির সঙ্গে নির্জনে একান্ত ব্যক্তিগত আত্মিক যোগাযোগের পরিবেশে এসে দলে দলে ভিড় জমায় আমোদঅভিলাষী টুরিস্ট। শান্ত নিসর্গকে উপদ্রুত করে তুলতে না পারলে টুরিস্ট হিসাবে উপস্থিতি জানান দেওয়া যায় না। এ ধরনের কোলাহলমুখর পরিবেশ রোমান্টিক পর্যটকের কাছে শুধু নয়, প্রকৃতির জগতেও বিভীষিকা, কিন্তু 'মাস টুরিজমের ' প্রাণবায়ু। ভারতবর্ষে গণ-পর্যটনের প্রতিপত্তি যখন দ্রুত বেড়ে চলেছে, তখন শঙ্কার প্রহর গুণছে রোমান্টিকেরা। নির্জন সমুদ্রসৈকত ধ্যানমগ্ন পাহাড়অরণ্য, নির্মল পার্বত্য স্রোতস্বিনী তাদের প্রিয় বিচরণভূমি। সেখানে আমোদপ্রিয়, দলবদ্ধ জনতার সোচ্চার উপস্থিতির পরিণাম অনুমেয়। সে দুর্ভাবনা ভাষা পেয়েছে দীর্ঘদিন আগে, 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের কলমেঃ 'এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য,কুন্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊধর্ব্বাসে পালাইবেন---মানুষঢুকিয়া এই মায়াকাননের মায়াও দুর করিবে, সৌন্দর্যও ঘুচাইয়া দিবে।'১৯ 'চাঁদের পাহাড়' -এর শঙ্কর অচেনার আনন্দে পাড়ি জমায় সুদূর আফ্রিকার অরণ্যে। তার সেই রোমান্টিক আনন্দের শরিক পথের পাঁচালির অপুও।

আরণ্যক উপন্যাসে লবটুলিয়ার অরণ্য - প্রকৃতির বর্ণনায় সত্যচরণ বিহ্বলঃ ‘গভীর রাত্রে ঘরের বাইরে একা আসিয়া দঁ াড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ ধূ জ্যোৎস্না ভরা রাত্রি রূপ। তার সৌন্দর্য্যে পাগল হইতে হয়--- একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না---আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে রূপ না দেখাই ভাল -- সর্বনাশী রূপ সে-সকলের পক্ষে, তার টাল সামলানো বড় কঠিন।’ এই টাল সামলাতে না পারা পর্যটকদের একজন-- উইলসন। সমারসেট মম-এর লোটাস ইটার গল্পের নায়ক। ইতালি ভ্রমণ তার জীবনের স্রোতটিইআমূল বদলে দিল। নিসর্গ--সৌন্দর্যে মোহিত ইউলসন লন্ডনে ব্যাঙ্কের সুখী চাকরি ছেড়ে, বৈষয়িক জীবনে ছেদ টেনে ফিরে গেল সেই প্রকৃতির কাছেই। বাকি জীবনটা জীবিকার পরোয়া না করে লোকসমাজের আড়ালেই কাটল তার। অবশেষে উইলসনের দেহ আ বিষ্কৃত হল সেই টিলার মাতায় সেখান থেকে সারারাত হ্রদের জলে চাঁদের আলোয় মোহিনী রূপ দেখে সে আর সহ্য করতে পারেনি। সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক’ ছবিতে মামাবাবু তাঁর ছোট্ট নাতিটির জন্য একটিই ছোট্ট বার্তা রেখে যান, ‘কূপমণ্ডুক হোয়ো না।’ মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে মামাবাবু এক অঅবাঞ্ছিত আগন্তুক। তাঁর ভবঘুরে জীবন ও উপলব্ধি সম্পর্কে সন্দেহের ভূকুটিই একমাত্র বরাদ্দ মধ্যবিত্ত প্রতিত্রিয়া।

কোলাহল বারণ হলে পর্যটন বিস্বাদ। কার্নিভ্যালের পরিবেশ উপহার দিতে না পারলে পর্যটনকেন্দ্র জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না। ফলত তার ব্যবসায়িক গুত্বও গড়ে ওঠেনা। ভ্রমণসুখ আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য নানা নামে তার পরিচয় নেচার টুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম, হেরিটেজ টুরিজম, ওয়াইল্ড লাইফ টুরিজম, ইকো টুরিজম --- যে নামেই ডাকা হোক, এক একটি টুরিস্ট স্পটের সমৃদ্ধি সর্বতোভাবেই নির্ভর করে সমষ্টিবদ্ধ পর্যটকেরযাতায়াত ও পরিষেবাগত সন্তোষের ওপর। নিজেদের চারপাশে আরও অজস্র ভ্রমণরসিক বহিরাগতকে ঘোরাফেরা করতে না দেখলে ভ্রমণম ানসিকতা ব্যাহত হয়। জায়গাটির মাহাত্ম্য ম্লান হয়ে যায়। নিজেকে একজন কৃতবিদ্য পর্যটক ভেবে ওঠাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। পর্যটকের ভিড়ই ভ্রমণের আধুনিক আবহ। জনসমাগম যথেষ্ট হলে পরিষেবাওসন্তোষজনক হয়ে ওঠে। পুরী, দীঘা কিংবা গোপালপুরের মতো জনপ্রিয় সমুদ্রতটে সফরসুখী জনতার ভিড় আরও মানুষকে হাতছানি দেয়। অখ্যাত সৈকতের শান্ত নির্জনতা যত মনোলোভাই হোক, বাঞ্ছিত আবহ উপহার দেবার অক্ষমতা এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠতে না পারার কারণেই উপেক্ষিত। তা ছাড়া, দ্রষ্টব্য স্থানে নিজেকে দ্রষ্টব্য হিসাবে উপস্থাপিত করে তোলার দায়ও কম গুত্বপূর্ণ নয়। রোমান্টিক পর্যটক তাই সবসময়ই চায় তার দ্রষ্টব্যস্থানটি চুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠার আগেই ঘুরে আসতে। আজ থেকে বছর দশেক অ াগেও যে ব্যক্তি সিকিম বেড়াতে গিয়ে শান্ত ছোট্ট পেলিং গ্রামটি দেখেছেন, দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়ে তিনি যৎপরোনাস্তি হতবাক। সেখানে দর্শনীয়ের তালিকায় সবার ওপরে, বলতে গেলে, রাতারাতি গজিয়ে ওঠা সার সার হোটেল। মজার ব্য াপার, গণ--পর্যটনের প্রভাবে রোমান্টিক পর্যটন হারিয়ে যেতে বসেছে, অথচ পর্যটন বিপণনে এক একটি স্থানের রোমান্টিক আবেদনেই লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞাপনী ম্যাজিক। সমষ্টিগত পর্যটনকে কেউ কেউ বলেন leisured migration । সমষ্টিগত বা সবান্ধব ছুটি কাটানোর জন্য অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে অলস অবসর বিনোদন। এরা পরিবেশবিচ্ছিন্ন, নিছক আমোদসন্ধানী। ব াইরে দূরে ভিন্ন পরিবেশে অভিনব উপভোগের মধ্যে দিয়ে সময়যাপনের প্রত্যাশাএই নিষ্ক্রিয় ভ্রমণবিলাসিতার অঙ্গ। লবটুলিয়ার জঙ্গলে কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা মধ্যবিত্ত পরিবারের আচরণে স্তম্ভিত ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ। এই পর্যটকশ্রেণি যে দ্রুত বেড়ে চলেছে তা বিলক্ষণ ধরা পড়ে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার একটি সা ম্প্রতিক বিজ্ঞাপনে। অরণ্যের মাঝখানে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা। সেখানে শহুরে জীবনের নানা উপকরণ ছড়ানো। ক াপড়িশ, গেলাশ-বোতল থেকে শু করে ক্যাসেট প্লেয়ার, গিটার ইত্যাদি। মাঝখানে একদঙ্গল শহুরে, মাতাল পর্যটক। বেস ামাল অবস্থায় তারা তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে। আর ওদিকে জঙ্গ লের উপদ্রুত, ভয়ার্ত জীবকুল প্রাণভয়ে দৌড়ে প ালাচ্ছে দিগ্বিদিকে। ওপরে লেখা--জানোয়ারেরা জঙ্গলে থাকে না, শহর থেকে আসে। ছোট্ট স্লোগানটি গোটা ছবিটির বার্ত াবহ। এই পর্যটকরাই শিল্পের পাথেয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com